● শুরু হোল নতুন কাহিনী

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। ফরাসী অধিকৃত আলজেরিয়ার মোসটাগানেম শহরের এক মধুর অপরাহ্ন। ফরাসী বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন-হেক্টর সারভাদাক তাঁর আর্দালী বেন জুফকে নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে চলেছেন। সামরিক বাহিনীর অফিসারের মন কিন্তু এক ভিন্নতর চিন্তায় কাতর। মনের দিগন্ত আড়াল করে এক অসামান্য রূপসী মাদাম-দ্য-এলের হাসি-হাসি মুখ। রণক্ষেত্রের সামান্যতম চিহ্নও তাঁর চিন্তার জগতে নেই।

খানিক দূরেই কাউন্টকে পথে দেখা গেল।
ধনের গর্বে যেন টগবগ করছে। আমিও সামরিক বাহিনীর ক্যাপ্টেন – সম্মান এবং ক্ষমতায় অনেক উপরে।
এক জন কাউন্টকে কী ভাবে জব্দ করতে হয় তা জানি। তবে ভালোয় ভালোয় যদি আমার প্রস্তাব মেনে নেয় তো মন্দ হয় না।
বেন যা সন্দেহ করছে তা তো অমূলক নয়। দেখা যাক --
এই যে মিস্টার কাউন্ট, শুনুন।
আমাকে বলছেন?
আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার অনুরোধ, মাদাম-দ্য-এলের কাছ থেকে আপনি দূরে থাকুন।
কারণ?
আমি তাঁকে বিয়ে করতে চাই। আপনি তাঁর সঙ্গে অতো মেলামেশা করবেন না।
বাহ, চমৎকার প্রস্তাব! আপনার ভদ্রতাবোধ তো অসাধারন।
কিন্তু মশায়, আমাকে এমন উপদেশ দেবার আপনি কে?
মাদাম আমাকে পছন্দ করেন, আমিই তো তাঁকে বিয়ে করবো। সরতে হবে আপনাকেই।
অসম্ভব, প্রান থাকতে নয়।
আপনি তাহলে দ্বৈরথের জন্যে প্রস্তুত হোন।
আপত্তি নেই, বলুন - কবে এবং কোথায় এ যুদ্ধ হবে।
ইচ্ছে করলে আপনিইতো স্থির করতে পারেন।
না, আপনিই বলুন।
Gautam

বেশ। আগামী কাল পয়লা জানুয়ারী। সকাল নটায় আপনি শেলিফ নদীর তীরে যে পাহাড়টা রয়েছে, সেখানে চলে আসুন। রাজী?
অবশ্যই। আপত্তি করবার কী আছে?
আনন্দের কথা। কালই তাহলে মীমাংসাটা হয়ে যাক — মাদাম-দ্য-এল কার, আপনার, না আমার?
ফিরে গেলেন ক্যাপ্টেন।
ওহ, এই মানুষগুলো যেন সর্বগ্রাসী। এদের ক্ষুধা কিছুতেই মেটে না। মাটি নিয়েছে, এবার সামাজিক জীবনও দখলে আনতে চায়।
সারভাদাকের মনে আর এক কথা।
মুখ দেখে মনে হোল – ভয় পেয়েছেন কাউন্ট।
সেনাবাহিনীর সাময়িক আবাসের পথে এগিয়ে চললেন ক্যাপ্টেন। স্থানীয় ভাষায় তাঁর কুটিরটির নাম-গোর্বি।
আজ আমার খুব কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে বেন।
এ তো খুব আনন্দের কথা স্যার।
সত্যি, এতো সহজে, আর এতো তাড়াতাড়ি যে মাদামকে পেয়ে যাবো, স্বপ্নেও ভাবিনি।
আর মাত্র পনেরো-ষোল ঘন্টা! ওহ, কী আনন্দই না হচ্ছে। কোথাও কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী আর থাকবেনা। মাদাম-দ্য-এল হবেন আমার জীবন-সাথী।

ওই!

আহ!

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সামরিক আবাসটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো। প্রানের ভয়ে নির্গমন পথের দিকে এগিয়ে গেলেন সারভাদাক।

4

মনে হয় ভূমিকম্প--কিংবা তার চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে গেল। এ কী দুর্দৈব বেন জুফ?

তাড়াতাড়ি করুন স্যার, নইলে চাপা পড়তে হবে।

সব স্বপ্ন কোথায় ওলট পালট হয়ে গেল। সামনে শুধু একটাই চিন্তা – প্লান! তাকেই এখন সবার আগে রক্ষা করা দরকার।

চিত্রনাট্য অনিল কর্মকার • চিত্ররূপ-গৌতম কর্মকার।

জুলে ভার্নের অফ অন এ কমেট অবলম্বনে —

● মূল কাহিনী – জুলে ভার্ন (অফ অন এ কমেট)

চিত্রনাট্য — অনিল কর্মকার / চিত্রায়ন — গৌতম কর্মকার

হা ভগবান! মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও যে আর নেই! কে এমন শত্রুতা করলো? এতো শক্তি তো কাউন্টের হবে না। সন্ধ্যার আগেই তো অঘটনটা ঘটেছিল, কিন্তু এখন দেখে তো সকাল মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ স্যার, ঐ দেখুন — সূর্য উঠে গেছে!

হ্যাঁ — সূর্য! কিন্তু এ কী! সূর্য কি কখনো পশ্চিম দিকে ওঠে? নাকি আমি ভুল দেখছি বেন? আমার মাথার ঠিক নেই।

না স্যার, ঠিকই তো বলছেন। সূর্য তো পশ্চিম দিকেই উঠছে।

কাল সন্ধ্যা থেকে কী যে সব ঘটছে!

হঠাৎ করে দ্বৈরথের কথাটা মনে পড়ে গেল।

তাইতো! দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময় হয়ে গেল। চলো বেন, শেলিফ নদীর তীরে আমাদের পৌঁছুতেই হবে। নইলে কাউন্ট ভাববেন — আমরা ফরাসীরা কথা রাখতে জানি না। চলো, ঘোড়াদুটোকে খুঁজে দেখি।

এমন অবস্থায় যাবেন স্যার?

নিশ্চয়। নইলে মান থাকবে কেন?

6
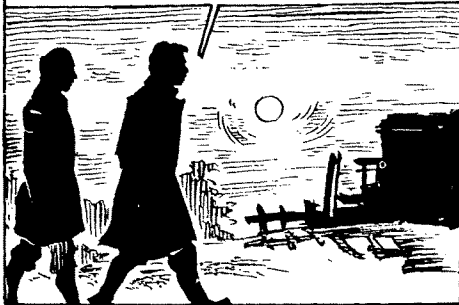
সূর্য কী তরতর করে উঠে আসছে দেখেছো। যেন ভয় পেয়ে পালাচ্ছে।
ঠিক সময়ে পৌঁছুতে পারবো তো? ঘোড়াদুটো যদি না পাই···
ঘোড়া কিন্তু যথাস্থানেই ছিল।
যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।
চলো বেন, বেরিয়ে পড়া যাক। নইলে সম্মান রক্ষা করা যাবে না।

দূরে যেন কেমন গর্জন শোনা যাচ্ছে। যেন সমুদ্র রাগে ফুঁসছে। কিন্তু কাছে তো রয়েছে শেলিফ — একটা শান্ত নীরব নদী। সমুদ্র তো এখন আমাদের বিপরীত দিকে। সব যেন কেমন একটা কুহকের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

নদী ওদিকে সত্যি সত্যিই সমুদ্র হয়ে গেছে।
আশ্চর্য, পৃথিবীর আকাশ মাটি জল কারও খেয়ালখুশীতে সব বদলে গেল নাকি!

কিন্তু কাউন্টকেই তো এখানে দেখছি না! কাউন্ট কি তবে আসেননি?
ফিরে চলুন স্যার।
না বেন, পাহাড়ের উপরে গিয়ে দেখা দরকার।

পাহাড়ের নমনীয় ঢাল বেয়ে দু জনেই উঠে গেলেন।
এখানেও নেই — কাউন্ট কি তবে সত্যিসত্যিই আসেননি, নাকি আত্মগোপন করে আছেন অতর্কিতে আক্রমণ করবার জন্যে?

অস্ফুট স্বরে পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন সারভাদাক।
বেরিয়ে আসুন কাউন্ট, লুকিয়ে থেকে নিজেকে ছোট করবেন না। আমি প্রস্তুত--আশা করি আপনিও।
কাউন্টের ও কিছু বিপদ ঘটেছে মনে হয়, তাই আসেননি। ফিরে চলুন স্যার। আমার যেন কেমন ভয়-ভয় করছে।
আর একটু দেখা যাক; তুমিও দেখো—দূরে যদি কোথাও দেখা যায়।
দেখতে গিয়ে আবার নতুন অঘটন।
একি, সূর্য যে এরই মধ্যে ডুবে যাচ্ছে! আর-- আর-- ওটা যে পূর্ব দিক মনে হচ্ছে।
হ্যাঁ স্যার, সত্যিই পূর্ব দিক। তাড়াতাড়ি করুন, আমরা ফিরে যাই।
তাই চলো বেন। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে।
কী করি! কোথাও একটা মানুষজন পর্যন্ত নেই। গেল কোথায় সব। রাতারাতি আমাদের এই অঞ্চলটা যেন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।
রাত দিনের দৈর্ঘ্য হঠাৎ অর্ধেক হয়ে গেল। সূর্যের গতিপথ পশ্চিম থেকে পূর্বে এসে গেল। এ কেমন করে সম্ভব?

● মূল কাহিনী – জুলে ভার্ন (অফ অন এ কমেট)

চিত্রনাট্য — অনিল কর্মকার / চিত্রায়ন — গৌতম কর্মকার

একটা মানুষ পর্যন্ত কোথাও দেখা যাচ্ছে না। গত কালের ঘটনায় সব ওলট-পালট হয়ে গেছে। একটা বসতিও কোথাও দেখছি না। আহার্য সংগ্রহ করা কঠিন হবে খুব।

দিনের পর দিন দুজনে চলেছেন। ক্যাপ্টেন সারভাদাকের মনে সুখ নেই।

মাদাম-দ্য-এল কি আর বেঁচে আছেন, না কি তিনিও চিরতরে হারিয়ে গেছেন?

সমুদ্রের তীর ধরে অবিরাম চলা। ছোট ছোট দিন আর ছোট ছোট রাত। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।
আমরা দু জনেই মনে হচ্ছে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছি বেন।
আমারও তাই মনে হচ্ছে স্যার।

একদিন হঠাৎ গাছপালা গুলো কেমন পরিচিত মনে হোল।
এ কোথায় এলাম বল তো বেন? সব যেন কেমন চেনা-চেনা লাগছে?
আমিও ঠিক এ কথাই ভাবছি স্যার।

ঐ দেখুন স্যার, সামনে একটা ভাঙা গোরবি। ঈশ্বর মুখ তুলে চেয়েছেন। সামান্য একটু মেরামত করে নিলেই আমাদের বাসস্থানের সমস্যাটা মিটে যাবে।

কাছে যেতেই কিছু চমকে উঠলেন সারভাদাক।
বেন, দেখো, দেখো- এ তো সেই আমাদেরই গোরবি।

কিন্তু আমরা তো ক্রমাগত উল্টো পথ ধরে যাচ্ছিলাম। ফিরে আসা তো সম্ভব নয়।
আমার মনে হচ্ছে আলেয়া ভূতের খপ্পরে পড়েছি স্যার।
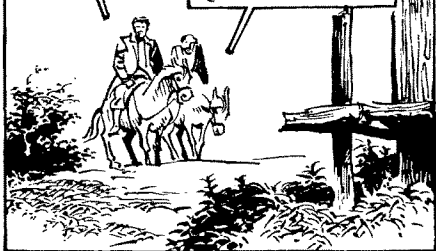
ঘাড়ে চাপলে শুনেছি এভাবেই মানুষকে পথ ভুলিয়ে মারে।
না বেন, আমরা একটা দ্বীপের মধ্যে আটকে পড়েছি। চারদিক থেকে সমুদ্র আমাদের ঘিরে ধরেছে।

বেশী দিন এভাবে চললে আর সহ্য করা যাবে না বেন। জ্বলে পুড়ে মরতে হবে। সমুদ্রের জলও কেমন গরম হয়ে যাচ্ছে দেখেছো?

আত্মরক্ষা করার কোনও উপায় কি নেই স্যার?

কিছুই তো মাথায় আসছে না।
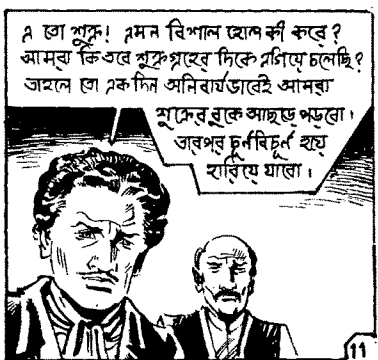
এ তো শুক্র! এমন বিশাল হোল কী করে? আমরা কি তবে শুক্রগ্রহের দিকে এগিয়ে চলেছি? তাহলে তো এক দিন অনিবার্যভাবেই আমরা শুক্রের বুকে আছড়ে পড়বো। তারপর চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে হারিয়ে যাবো।

চিন্তার কথা স্যার। শুক্র তো মনে হচ্ছে চাঁদের মতোই কাছে এসে পড়েছে। কিন্তু চাঁদ কোথায় গেল?
জানি না। এখন শুক্রটাকেই সামলাও।

আত্মরক্ষার কোনও উপায় তো দেখতে পাচ্ছি না বেন। শুক্র ক্রমাগত কাছে এসে পড়ছে।

একদিন শুক্র গ্রহ সুবিশাল হয়ে দেখা দিল।
উঃ, এবার অনিবার্য মৃত্যু!

কয়েকটা দিন দুর্বিসহ যন্ত্রণায় কেটে গেল। চোখের পাতা এক করা গেলনা। তারপর..
আঃ, এ যাত্রা মনে হচ্ছে বেঁচে গেলাম বেন।
শুক্র ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে।

এক দিন দিগন্তের দিকে দূরবীন নিয়ে দেখতে দেখতে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো বেন জুফ।
স্যার—স্যার—ঐ দেখুন!
কী দেখা যাচ্ছে বেন?
একটা জাহাজ।

দূরবীনে চোখ রেখে সারভাদাকও মুগ্ধ।
আঃ, সত্যিই একখানি জাহাজ! সম্পূর্ণ অক্ষত।

ধূমকেতুর সওয়ার
• মূল কাহিনী - জুলে ভার্ন (অফ অন এ কমেট)
চিত্রনাট্য — অনিল কর্মকার / চিত্রায়ন — গৌতম কর্মকার
দূরবীনে চোখ রেখে খানিক আশ্বস্ত হলেন সারভাদাক।
যাক, জাহাজটি আমাদের চেনা !
সত্যি, স্যার ?
হ্যাঁ বেনজুফ। কাউন্ট টিমাসচেফের জাহাজ দোব্রিয়ানা।
জাহাজ ধীরে ধীরে তীরভূমির দিকেই এগিয়ে আসছিল। ডেকের উপর মানুষের মুখ।
আসুন, চলে আসুন কাউন্ট —আমরা এখানে !
দোব্রিয়ানা ধীরে ধীরে থেমে গেল। নৌকা নামিয়ে দিয়ে উঠে বসলেন কাউন্ট।
সঙ্গে জাহাজ-চালক লেফটেনান্ট প্রোকোপ, আর কয়েকজন নাবিক।
ঐ ওরা আসছেন স্যার। আর আমাদের উদ্ধার পেতে দেরী হবে না।
Gautam
মানুষ দু জনকে চিনতে পেরে টিমাসচেফও উল্লসিত।
যাক, চেনা মানুষ।
দ্বন্দ্বযুদ্ধটা হয়নি। ক্যাপ্টেন কী ভাবছেন - কে জানে।
কী আর ভাববেন স্যার ? ওঁদের অবস্থাই কি আর আমাদের চেয়ে ভালো ছিল?
এখন কিন্তু ওঁদের চোখে মনে ভরসা পাচ্ছি প্রোকোপ। বিপদের দিনে চেনা মানুষকে কাছে পেলে যে এমন আনন্দ হয়, আগে জানতাম না।

আমাদেরও সেই একই অবস্থা, পরিচিত পৃথিবী থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। এখন আমাকেও আপনাদের সঙ্গী করে নিন কাউন্ট। সাগরে সাগরে টহল দিয়ে দেখা দরকার - অবশিষ্ট পৃথিবীর কী অবস্থা।

অন্য কোনও জাহাজ যদি আসে, তাদের তো সাময়িক ভাবে আশ্রয় দিতে হবে। কী বেন, আপত্তি নেই তো?

আপনার সিদ্ধান্ত আমার কাছে অমোঘ স্যার।
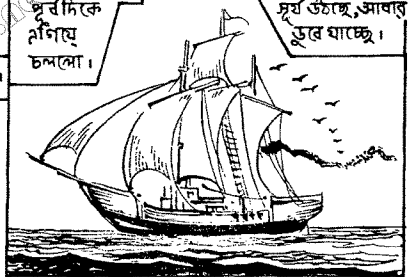
বেন জুফকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে সারভাদাক নৌকায় চড়ে বসলেন। শুরু হোল অনির্দেশ্য যাত্রা। দোব্রিয়ানা একটু একটু করে তাঁদের নাগালের মধ্যে এসে গেল।
বন্দরে আরও কত্তো জাহাজই তো আসা-যাওয়া করতো, সেসব কোথায় গেল?
বেন জুফের মনে কিন্তু দুঃখ নেই, তার চিন্তা প্রভুর জন্যে।
আমি তো এখানে নিরাপদেই থাকবে--স্যার চললেন অজানার সন্ধানে। হে ঈশ্বর ওঁকে দেখো।
জাহাজ এবার পূর্বদিকে এগিয়ে চললো।
ছয় ঘন্টা পর পর সূর্য উঠছে, আবার ডুবে যাচ্ছে।
জাহাজ এগিয়ে চলেছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত।
কী ব্যাপার বলুন তো ক্যাপ্টেন, গোটা আলজিরিয়া দেশটা গেল কোথায়?
শুধু আলজিরিয়া কেন বলছেন, গোটা আফ্রিকা মহাদেশটাই তো মনে হচ্ছে জলের তলায় তলিয়ে গেছে।
গোটা একটা মহাদেশের পাতালপ্রবেশ, কী বলছেন ক্যাপ্টেন সারভাদাক?
তা নয়তো কী, ডাঙার চিহ্ন কোথাও দেখছেন?
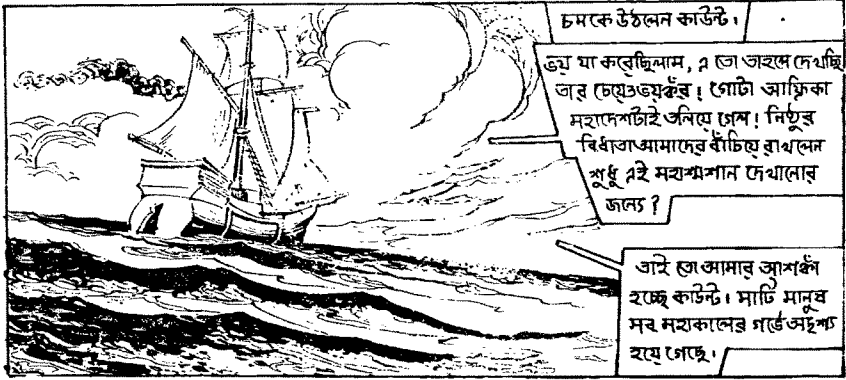
চমকে উঠলেন কাউন্ট।
ভয় যা করেছিলাম, এ তো তাহলে দেখছি তার চেয়েও ভয়ঙ্কর! গোটা আফ্রিকা মহাদেশটাই তলিয়ে গেল! নিষ্ঠুর বিধাতা আমাদের বাঁচিয়ে রাখলেন শুধু এই মহাশ্মশান দেখানোর জন্যে?
তাই তো আমার আশঙ্কা হচ্ছে কাউন্ট। মাটি মানুষ সব মহাকালের গর্ভে অদৃশ্য হয়ে গেছে।
কিন্তু কেমন করে এটা ঘটলো? অতি বড় বিজ্ঞানীও তো এমন সম্ভাবনার কথা কখনো বলেননি। দিনের পর দিন শুধু সমুদ্র আর সমুদ্র -- সব ডাঙাই অদৃশ্য হয়ে গেল?
অফিসার, অতো মনযোগ দিয়ে কী দেখছেন?
এক্ষুনি কয়েকটা গাঙচিলকে যেন উড়ে যেতে দেখলাম।
বলেন কি! তাহলে তো ডাঙা থাকতেই হয়।
ক্যাপ্টেন আর কাউন্ট — দুজনেই উৎসুক হয়ে এগিয়ে গেলেন।
কিন্তু এমন অবিশ্বাস্য স্থানে ডাঙা! এ কেমন করে সম্ভব? ভূগোল তো এমন কথা বলে না।
একত্রিশে ডিসেম্বরের ঘটনা কোনও ভূগোল কিংবা বিজ্ঞান মেনে তো ঘটেনি। আমার তো মনে হচ্ছে - এখন সব কিছুই সম্ভব।

ধূমকেতুর সওয়ার

• মূল কাহিনী – জুলে ভার্ন (অফ অন এ কমেট)

চিত্রনাট্য — অনিল কর্মকার / চিত্রায়ন — গৌতম কর্মকার
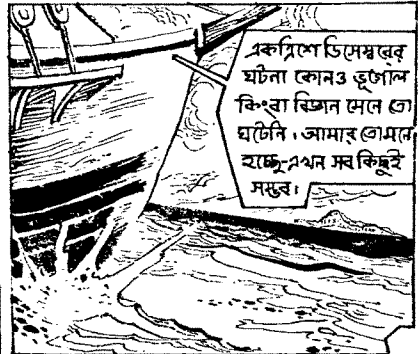
স্থলভাগের দেখা পেয়ে সকলেই ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

কী আশ্চর্য বলুন তো ক্যাপ্টেন, যেখানে জল ছাড়া কিছু থাকার কথা নয়, সেখানে মাথা তুলে উঠেছে সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়া। অন্যদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল বিশাল মহাদেশ।

দিন রাতের দৈর্ঘ্যও হয়ে গেল অর্ধেকের অর্ধেক।

আচম্বিতে একটা আর্তনাদ জেগে উঠলো।
গেল--গেল--স-ব গেল!
দোরিয়ানার সামনেই একটা বিশাল খাড়া পাহাড়!

লেফটেনান্ট প্রোকোপ কিন্তু অবিচল।
দেখেছেন স্যার, পাহাড়ের গায়ে একটা ফাঁক দেখা যাচ্ছে। কোনও ভাবে যদি দোরিয়ানাকে ওর ভিতর দিয়ে চালিত করা যায়, তবে এ যাত্রা হয়তো রক্ষা পেলেও পেতে পারি।

দৃঢ় হাতে হাল ধরে প্রোকোপ নির্ভীক লক্ষ্যে স্থির হয়ে রইলেন। দোরিয়ানা এখন একটা জাহাজ মাত্র নয়, তাঁর শরীরেরই একটা অংশ।

ঐ-ঐ- খাঁড়ির মুখ। মৃত্যু যেন হাঁ-মুখ করে জাহাজটাকে গিলে নিতে আসছে।
প্রোকোপ ছাড়া বাকি সবার চোখ ভয়ে বন্ধ হয়ে গেল।

নিপুন লেফটেনান্টের অসীম দক্ষতায় জাহাজটা এবারেও বেঁচে গেল।
আহ, দু পাশে উঁচু পাহাড়ের দেয়াল! সব তরঙ্গ এখানে শান্ত। প্রকৃতি যেন নিজ হাতে চার পাশ সুরক্ষিত করে রেখেছেন। ঝড়ের আস্ফালন এখানে ব্যর্থ। ভৌতিক শক্তিদের প্রবেশ নিষেধ।

প্রকৃতির আপন হাতে গড়া
পোতাশ্রয়ে পরম নির্বিঘ্নে সময় কেটে যেতে লাগলো। ধীর গতিতে
পথ দেখে দেখে এগিয়ে চললো দোব্রিয়ানা। সকলেই এখন নিশ্চিন্ত।

ক্রমে রাত নেমে এলো। আকাশে
দেখা দিল একরাশ তারা।
ক্যাপ্টেন, দূরে একটা দ্বীপ
দেখা যাচ্ছে না?
হ্যাঁ লেফটেনান্ট।

অন্ধকার চিরে হঠাৎ জ্বলে উঠলো একটা হাউই।
সর্বনাশ! কেউ কি আমাদের আক্রমণ করবে নাকি?

মনে তো হয় না। হাউইয়ের পর হাউই ফাটছে। মনে
হয়-কেউ সংকেত করছে। দ্বীপের ভিতর মানুষ
তাহলে আছে, এবং তারা আমাদেরই মতো সভ্য।
জানবার জন্যে সকাল পর্যন্ত
আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।
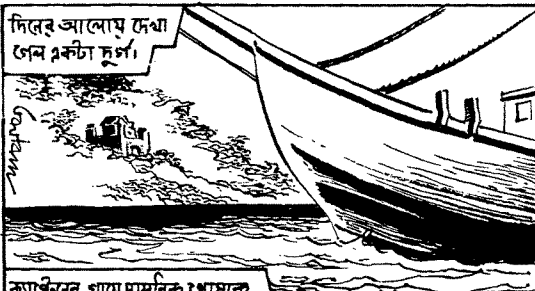
দিনের আলোয় দেখা
গেল একটা দুর্গ।
ক্যাপ্টেনের গায়ে সামরিক পোষাক,
কিন্তু সামান্যতম অস্ত্রও জাহাজে নেই। তবু সাহসে ভর করে রাজী হয়ে গেলেন
অনেকেই। শুরু হোল যাবার আয়োজন, নতুন কিছুর জন্যে উন্মুখ প্রতীক্ষা।

নৌকা বেয়ে তর তর করে সবাই দ্বীপের
দিকে এগিয়ে চললেন।
কে জানে, কারা আছে ঐ দুর্গে। তারা
আমাদের শত্রু হবে, না মিত্র?

উপকূল থেকে চড়াই বেয়ে দুর্গের প্রবেশপথে সবাই পৌঁছে গেলেন। সামনেই দুজন মিলিটারী অফিসার।
যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। দেখে তো মনে হচ্ছে- ব্রিটিশ।
গুডমর্নিং। ওয়েলকাম মিস্টার...
আপনাদের পেয়ে কী আনন্দ যে হচ্ছে!
হেক্টর সার্ভাদাক। ফরাসী বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন। ইনি কাউন্ট টিমাসচেফ।
ইনি মেজর স্যার জন টেম্পল এলিফ্যান্ট, আমি কর্নেল হেনেজ ফিঞ্চ মর্ফি।
আপনাদের আগমনের কী উদ্দেশ্য, দয়া করে বলবেন?
একত্রিশে ডিসেম্বরের মহাপ্রলয় নিশ্চয়ই দেখেছেন?
সেই থেকে আমরা জলে জলেই ঘুরছি - ডাঙার সন্ধানে, মানুষের সন্ধানে।
ভাগ্যিস বেরিয়েছিলেন, নইতো আপনাদের দেখা পেলাম। সমান পর্যায়ের মানুষ দেখার যে কী আনন্দ!
Goulam
ইউরোপ, মানে লন্ডনের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ আছে কি?
সম্প্রতি নেই। তবে শিগগিরই ইংলন্ড থেকে একটা জাহাজ এসে পৌঁছানোর কথা আছে। দু' চার দিনের মধ্যেই।
ইংলন্ড এখনো টিঁকে আছে তো?
অবশ্যই আছে। ব্রিটিশ মাটিতে দাঁড়িয়ে এমন কথা কেমন করে বলছেন?
ব্রিটিশ মাটি! কী নাম বলুন তো জায়গাটার।
কেন, জিব্রাল্টার।
জি-ব্রা-ল্টা-র!!!

● মূল কাহিনী – জুলে ভার্ন (অফ অন এ কমেট)

চিত্রনাট্য — অনিল কর্মকার / চিত্রায়ন — গৌতম কর্মকার

লেফটেন্যান্ট প্রোকোপের মনে এক অদ্ভুত চিন্তা উঁকি দিল।
দেখুন স্যার আমার মনে হয় পরিচিত পৃথিবীর উপর এখন আমরা নেই। ভূ-পৃষ্ঠের একটা টুকরো কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন কক্ষপথে ছুটে চলেছে।
আমরা তার উপর রয়েছি।
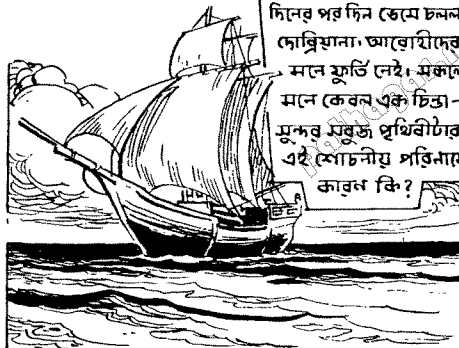
পশ্চিম দিকে সূর্য উঠার মত আজগুবী ঘটনা যখন ঘটছে তখন এরকম সম্ভাবনা হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না লেফটেনান্ট।

দিনের পর দিন ভেসে চলল দোব্রিয়ানা। আরোহীদের মনে ফুর্তি নেই। সকলের মনে কেবল এক চিন্তা- সুন্দর সবুজ পৃথিবীটার এই শোচনীয় পরিনামের কারন কি?
সমুদ্রের ফেনিল জলরাশির মধ্যে একদিন ভাসতে দেখা গেল এক চকচকে বস্তু।
ঐ দেখুন স্যার, একটা বোতল মনে হচ্ছে!

জিনিষটি তুলে আনা হল জাহাজে। ভিতরে পাওয়া গেল একটি চিরকুট।
বোতল নয়, এতো দেখছি টেলিস্কোপের খাপ!

ইংরেজী, ফরাসী, ইটালিয়ান আর ল্যাটিন-মোট চারটে ভাষাতে একটি মাত্র শব্দ লেখা আছে- গ্যালিয়া। আর একটা হিসাব পনেরই ফেব্রুয়ারী সূর্য থেকে আমাদের দূরত্ব।
Goutam

যিনি লিখেছেন, নিঃসন্দেহে তিনি পন্ডিত মানুষ।
গ্যালিয়া মনে হয় পৃথিবীর নতুন টুকরোটির নাম।

শুধু চারটে ভাষার দখলই নয়, মানুষটি জ্যোতির্বিদ্যারও চর্চা করেন। এখন তাঁর সন্ধান পাওয়া গেলে ভালো হত।
সন্ধান করে দেখতে হবে যদি দেখা পাওয়া যায়।
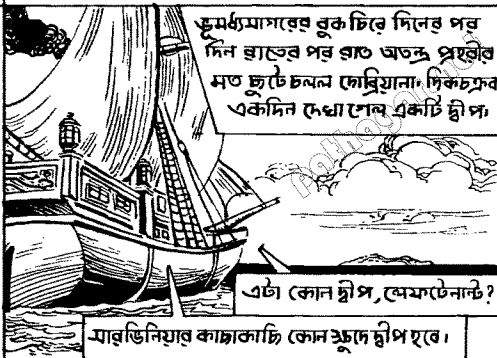
ভূমধ্যসাগরের বুক চিরে দিনের পর দিন রাতের পর রাত অতন্দ্র প্রহরীর মত ছুটে চলল দোব্রিয়ানা। দিকচক্রবালে একদিন দেখা গেল একটি দ্বীপ।
এটা কোন দ্বীপ, লেফটেনান্ট?
সারডিনিয়ার কাছাকাছি কোন ক্ষুদে দ্বীপ হবে।

জাহাজ থেকে নৌকা নামিয়ে ক্যাপ্টেন এবং কাউন্ট ছুটলেন দ্বীপটি পরিদর্শনে।

তটরেখা ছাড়িয়ে দ্বীপের ভিতর প্রবেশ করলেন দুজনে।
কি জানি এখানে আবার কোন বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে!
51

কিছুক্ষণ হাঁটার পর চোখে পড়ল একটি ছাগল।

ছাগলটার ভাবভঙ্গী দেখে অবাক লাগল দুজনের। কৌতূহলী কাউন্ট এবং মারভাদাক ছাগলটার পিছু পিছু ছুটলেন।
কিছু সময় পর সামনে দেখা গেল একটি গুহা।
ছাগলটা এই গুহার ভিতর ঢুকে পড়েছে।
গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি ছোট মেয়ে। পরনে তার শতচ্ছিন্ন পোশাক। আগন্তুকদের দেখে মেয়েটি আতঙ্কিত হয়ে উঠল।
আমাকে মারবেন না তো?
না মারব কেন? তোমার নাম কি?
নিনা। এই ছাগলটি আমার। নাম মার্জি।
একদিন রাতে ভয়ঙ্কর ঝাঁকুনিতে চারদিক লন্ডভন্ড হয়ে গেল। আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান ফিরতে দেখলাম শুধু মার্জিকে, আর কাউকে দেখলাম না। তখন থেকেই আমি এই গুহায় থাকি।
নিনা আর মার্জিকে নিয়ে সকলে ফিরে এলেন দোব্রিয়ানায়।

• মূল কাহিনী - জুলেভার্ন (অফ অন এ কমেট)

চিত্রনাট্য — অনিল কর্মকার / চিত্রায়ন — গৌতম কর্মকার
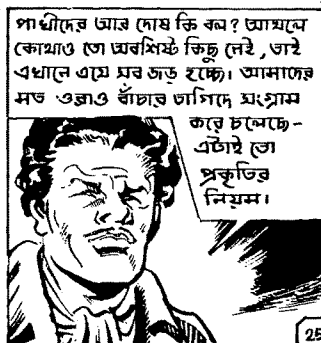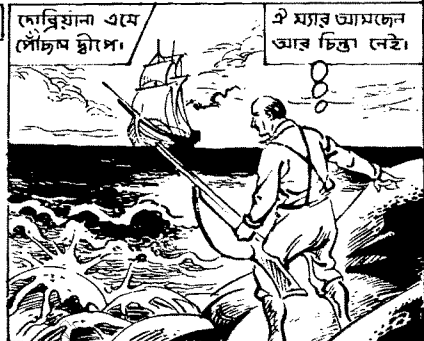
স্যার, অনেকদিন তো ঘুরে বেড়ালেন, পৃথিবীর অবস্থা এখন কি রকম?

আমাদের পরিচিত পৃথিবী এখন হয়তো লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে বেনফুজ! আমাদের নিয়ে ছোট্ট একটি ভূখণ্ড পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেসে চলেছে সৌরজগতের নতুন কক্ষপথে!

না স্যার, এরকম অসম্ভব ব্যাপার ঘটতেই পারে না!

অস্বীকার করে লাভ নেই বেনফুজ। সত্যিই আমরা আর পুরানো পৃথিবীতে কোনদিন ফিরতে পারব না।

সবাই মিলে হাত লাগিয়ে এই দ্বীপটাকেই সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে। পাকাপাকি ভাবে এখানেই আমাদের থাকতে হবে। আশা করি এগারোজনের খাবারের অভাব কোন দিন হবে না।

এগারো নয় স্যার, আমরা এখন বাইশ!
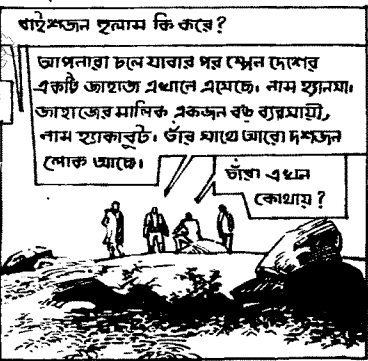
বাইশজন হলাম কি করে?

আপনারা চলে যাবার পর স্পেন দেশের একটি জাহাজ এখানে এসেছে। নাম হ্যানসা। জাহাজের মালিক একজন বড় ব্যবসায়ী, নাম হ্যাকাবুট। তাঁর সাথে আরো দশজন লোক আছে।

তাঁরা এখন কোথায়?

গর্ত খুঁড়ে পাতাল-গুহা বানিয়ে শীতকালটা কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে।
চমৎকার প্রস্তাব! কাল থেকেই কাজ শুরু করা যেতে পারে।

শুরু হল মাটি খোঁড়ার কাজ।

উৎসাহের সাথে কাজ করে চললেন সকলে। বেশীদূর কিন্তু এগোনো গেল না। কিছুটা কাটার পর নীচে পড়ল কঠিন শিলাস্তর।
অসম্ভব! এই শিলাস্তর ভেদ করা মানুষের সাধ্য নয়। গাঁইতিটাই ভেঙে গেল।
আমারটারও অবস্থা তাই!
বিকল্প কিছু ভাবতে হবে।
Goutam

শীতের আক্রমণ শুরু হয়ে গেল।
শীত যে হারে বাড়ছে তাতে করে দিন কয়েক পর গোরবিতে থাকা সম্ভব হবে না।

রাতটা কোন ক্রমে কাটিয়ে নতুন আশ্রয়ের সন্ধান শুরু হল।
বরফে চারপাশ ঢেকে যাচ্ছে
শীত আরো বাড়বে কাউন্ট।
Goutam

পরের দিন সকালে দোব্রিয়ানা রওনা হল আলোর উৎস অভিমুখে।

আগ্নেয়গিরির পাদদেশে গুহার সন্ধান পাওয়া যাবে নিশ্চয়। ঠান্ডা পড়ুক যত খুশী। অফুরান তাপ যুগিয়ে যাবে আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত জঠর।

28

• মূল কাহিনী - জুলে ভার্ন (অফ অন এ কমেট)

চিত্রনাট্য - অনিল কর্মকার / চিত্রায়ন — গৌতম কর্মকার

কিছুদূর যাবার পর চোখের সামনে ভেসে উঠল বিশালাকার এক আগ্নেয়গিরি। জ্বালামুখ থেকে পাকে পাকে নির্গত হয়ে চলেছে কালো ধোঁয়া

অগ্ন্যুৎপাত বেশ সামান্যই! শান্তশিষ্ট গোবেচারা আগ্নেয়গিরি।

আমাদের আর কোন ভয় নেই। তাড়াতাড়ি নৌকা নামাও, নির্ভয়ে ওখানে নামতে পারি।

দ্বীপের মাটিতে নেমে এলেন সকলে।

এদিকটাতে লাভাস্রোত নেই। বেশ নিরাপদ।

পাহাড়ের গা বেয়ে শুরু হল পর্বতারোহন।

এবার একটা গুহা মিললেই আর কোন ভয় থাকে না।

কিছুদূর ওঠার পর সামনে পড়ল একটি গভীর গর্ত।

সুড়ঙ্গ মনে হচ্ছে। ভিতরে ঢুকে দেখতে হবে।

গহ্বরের মুখ দিয়ে একে একে প্রবেশ করলেন অভিযাত্রীরা।
সুড়ঙ্গ ক্রমে চওড়া হয়ে নেমে চলেছে নীচের দিকে।
কী অপূর্ব প্রকৃতির ভাস্কর্য!
সুড়ঙ্গের ছাদ থেকে সুতোর মত ঝুলে আছে লাইম কার্বনেট।
সুড়ঙ্গ একজায়গায় এসে বিশাল আকার ধারন করেছে। পায়ের নীচে আগ্নেয়শিলার মসৃন আবরন। জমাট বাঁধা লাভার আস্তরন অদ্ভুত কারুকার্য সৃষ্টি করে রেখেছে গুহার দেওয়ালে।
বাসস্থানের পক্ষে আদর্শ!
ঠিক কথা কাউন্ট। এখানে বাইশটা মানুষ খুব আরামের সাথে বাস করতে পারবে। চলুন একবার অন্তত সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তটা দেখে আসি।
অভিযাত্রীরা নেমে চললেন আরো গভীরে। চাপ ক্রমে বাড়ছে। কমছে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমান। গহ্বর শেষ হয়ে রূপ নিয়েছে বিশাল অগ্নিকুন্ডে। তপ্ত লাভার উজ্জ্বল বিকিরনে চারদিক ঝলমল করছে। যত দূর দৃষ্টি যায় কেবল গলিত লাভার কূপ। মাঝে মাঝে আলোর রোশনাই জ্বলে উঠে ঠিকরে পড়ছে জমাট পাথরের দেওয়ালে। প্রকৃতির হাতে গড়া ভয়ংকর সুন্দর ফায়ার প্লেস দেখে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলেন অভিযাত্রীরা।
আর নয়, এবার ফিরে চলুন।

পরের দিন সকালেই শুরু হল স্থানান্তরের কাজ।

দ্বীপের যাবতীয় জিনিষপত্র, খাবার দাবার পৌঁছান শুরু হল আগ্নেয়দ্বীপে।

লন্ঠনের আলোয় আরো ভালো ভাবে দেখা গেল সুড়ঙ্গের ভিতরটা। মৌচাকের বাসার মত অসংখ্য প্রকোষ্ঠ দেখে সকলেই উল্লসিত।
বন্ধুগন আমাদের এই বাসস্থানের একটা নাম রাখা প্রয়োজন।

নিনা তার ছাগল মার্জিকে নিয়ে অবাক চোখে দেখছিল তাদের নতুন আশ্রয়স্থল।
কনিষ্ঠতম বাসিন্দা নিনার নামে আমাদের নতুন বাড়ীর নাম হোক নিনা-হাইভ।
চমৎকার প্রস্তাব!

উদয়াস্ত পরিশ্রম করে তিন দিনের মধ্যেই যাবতীয় মালপত্র পৌঁছে গেল নিনা-হাইভে। মহাশূন্যের বুকে দিকভ্রষ্ট মানুষগুলি নতুন জীবন শুরু করল আগ্নেয়গিরির জঠরে।
এবার শীত আমাদের কাবু করতে পারবে না।

নতুন জগতে কেটে গেল কয়েকটি দিন। তাপমাত্রা কমতে কমতে শূন্যের অনেক নীচে নেমে গেল। সমুদ্রের জল জমাট বেঁধে বিস্তৃত সাদা চাদরে পরিণত হল।
কিছুদূরে বরফের ফাঁদে আটকে পড়েছে দুটি জাহাজ — হ্যানসা আর দোব্রিয়ানা।
জমাট বরফের চাপে জাহাজদুটির ক্ষতি হবার ভয় আছে।

প্রচন্ড শৈত্যপ্রবাহ এড়াতে পালে পালে পাখী এসে জড় হচ্ছে আগ্নেয়দ্বীপে। একটুখানি তাপের আশায় দিনরাত চক্কর দিয়ে চলেছে

মাঝে মাঝে পাখীর দল ডানা ঝটপটিয়ে ঢুকে পড়ছে সুড়ঙ্গের মধ্যেও !
খাবারের আশায় এরা এখানেও হানা দিতে শুরু করল!
একদিন সুড়ঙ্গের মধ্যে একটি মুমূর্ষু পায়রাকে দেখে নিনা দু হাত দিয়ে তুলে নিল।
হঠাৎ কর্কশ শব্দে এক পাল পাখী তেড়ে এল নিনার দিকে
বাঁচাও
বাঁচাও

• মূল কাহিনী - জুলে ভার্ন (অফ অন এ কমেট)

চিত্রনাট্য — অনিল কর্মকার / চিত্রায়ন — গৌতম কর্মকার

তিনি লিখছেন :" খাবার দাবার ফুরিয়ে আসছে, পানীয় জল ও প্রায় শেষ। আর কতদিন বাঁচব জানিনা।"
তিনি কোথায় আছেন কিছু হদিস পেলেন ?
হ্যাঁ কাউন্ট। চিঠির তলায় একটি দ্বীপের নাম লেখা - ফোরমেনটেরা !

ফোরমেনটেরা! এ দ্বীপ আমি চিনি ক্যাপ্টেন। স্পেনের কাছে ব্যালিয়াচিক দ্বীপপুঞ্জের অন্যতম দ্বীপ এই ফোরমেনটেরা।
আমাদের উচিত এখুনি গিয়ে ভদ্রলোককে সাহায্য করা।

দূরত্ব তো কম নয়। এখান থেকে ফোরমেনটেরা তা আনুড দুশ মাইল তো হবেই! বেশীও হতে পারে। প্রশ্ন একটাই সেখানে যাবেন কি ভাবে?

সমুদ্রের জল তো এখন জমাট পাথর। স্কেটিং করে আমি যেতে পারব।
আপনি মহানুভব ক্যাপ্টেন সারভাদক। কিন্তু ...

কিন্তু তিনি যদি রুগ্ন এবং কাহিল হন - তখন কী করবেন? তাঁকে উদ্ধার করে এখানে আনতে পারবেন? তা ছাড়া আবহাওয়া অনুকূল নাও হতে পারে।

লেফটেন্যান্ট প্রকোপের মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল।
দেখুন স্যার, আমি একটি উপায় বাৎলাতে পারি।
তাড়াতাড়ি বলুন ..

তোব্রিয়ানার ছোট্ট নৌকাটির তলায় লোহার চাকা আর উপরে পাল খাটিয়ে দিলে হাওয়ার ঠেলায় বরফের উপর দিয়ে নৌকা গড়িয়ে চলবে। এই ভাবে আমরা ফোরমেনটেরা পৌঁছুতে পারি।
সুন্দর প্রস্তাব!

লেফটেন্যান্ট প্রকোপের পরিকল্পনা মাফিক তৈরী হল এক বিচিত্র বরফ যান।
আমিও আপনাদের সাথে যাবো ক্যাপ্টেন। তা না হলে দিক নির্ণয় করে আপনারা ফোরমেনটেরায় পৌঁছুতে পারবেন না।

পাল খাটানোর সাথে সাথেই হাওয়ার ধাক্কায় সচল হয়ে উঠল যানটি।
সমুদ্রের জল ঠান্ডায় যে রকম জমাট বেঁধেছে, আমাদের কোন অসুবিধা হবার কথা নয়।

ঝোড়ো হাওয়া শুরু হল। আমরা তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে পারব।

সমস্ত দিন এবং রাত সমুদ্রের জমাট বাঁধা বরফের চাদরের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলল বরফ-যান। সারাদিনের ক্লান্তিতেও রাতে কারো চোখে ঘুম এল না।

রাত শেষ হল। অন্ধকারের পর্দা ভেদ করে পূবের আকাশে দেখা দিল রক্তিম অগ্নি গোলক। উদিয়মান সূর্যের সোনালী আলোয় বরফ-দিগন্তে দেখা গেল একটি ভূখন্ড।
ফোরমেনটেরা।

দ্বীপের মাটিতে পা দিলেন অভিযাত্রীরা। শুরু হল অজ্ঞাত বন্ধুর অন্বেষণ।
ছোট্ট দ্বীপ। তিনি যদি এখনো এখানে থাকেন তাহলে খুঁজে বার করা কঠিন হবে না।

খানিক খোঁজাখুঁজির পর দূরে দেখা গেল একটি কুটির।
ঐ দেখুন।

হন্তদন্ত হয়ে তিনজনেই ছুটলেন। বাড়ীর দরজা ভেজানই ছিল, ঠেলে ভিতরে উঁকি দিলেন সকলে। খাটে শুয়ে আছেন একজন বৃদ্ধ।

বেঁচে আছেন তো?
বেঁচে আছেন.. বেঁচে আছেন। শরীর খুব দুর্বল। আমি এঁকে কোথায় যেন দেখেছি....!

স্মৃতি রোমন্থন করে সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন সারডাদক।
মনে পড়েছে! এ যে প্রফেসর পালমিরিন রোসেট্টি! প্রফেসর... প্রফেসর...
এখন ওঁকে ডাকাডাকি না করাই ভালো স্যার।

অচেতন বৃদ্ধকে কম্বলে মুড়ে নৌকায় তোলা হল। শুরু হল প্রত্যাবর্তন।
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিনা-হাইভে পৌঁছতে হবে।

● মূল কাহিনী—জুলে ভার্ন (অফ অন এ কমেট)

চিত্রনাট্য—অনিল কর্মকার / চিত্রায়ন—গৌতম কর্মকার

পৃথিবীর সাথে সংঘর্ষ হবার বহু আগে থেকেই ধূমকেতুটির উপর নজর রেখে আসছিলাম। তাই আমি জানি একত্রিশে ডিসেম্বর রাত্রে ঠিক কি ঘটেছে।
ধূমকেতুর ধাক্কায় পৃথিবীর একটি অংশ আলাদা হয়ে যায়।
পৃথিবীর সেই টুকরোটিকে পিঠে নিয়ে আপন কক্ষ পথে ছুটে চলেছে ধূমকেতুটি। আমরা এই মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ সেই টুকরোটির উপর রয়ে গেছি।
ধূমকেতু তো অনেক ধরনের হয়, এটি তাহলে কি ধরনের?
পিরিয়ডিক। নির্দিষ্ট সময় অন্তর ঘুরে ফিরে আসে আগের জায়গায়।
তার মানে তো স্যার আমাদের বাহনটি আবার পৃথিবীর কাছে ফিরে আসবে!
হ্যাঁ আসবে। সংঘর্ষ হবার সময় থেকে ঠিক দু-বছর পর।
এবং দ্বিতীয়বার পৃথিবীর এই টুকরোটি হয়তো আবার জোড়া লেগে যাবে আগের জায়গায়।
হুররে! তার মানে দুর্ভোগের দিন শেষ হয়ে আসছে।
একটা বছর তো কাটালাম, আরো একটা বছর বাকী কাউন্ট!
পর্বত কন্দরে কেটে গেল আরো কয়েকটি মাস।
কাউন্ট একটা জিনিষ লক্ষ করেছেন, তাপ বিকীরণ করে করে ক্রমেই ঠান্ডা হয়ে আসছে আগ্নেয়গিরিটি!
Goutam
38

ঠিক বলেছেন ক্যাপ্টেন মারভাদাক! আজকালতো ভিতরেও ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে। তাহলে কী করবেন ভেবেছেন?
পর্বতের আরো গভীরে বাসস্থানটি সরিয়ে নিয়ে যাবো।
উপযুক্ত গুহার সন্ধানে আবার নতুন করে অন্বেষণ শুরু হল।
এখানে হবে না। আরো গভীরে নামতে হবে।
অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি প্রশস্ত গুহার সন্ধান পাওয়া গেল।
তাপ এখানে বেশ আরামদায়ক। বাস করার পক্ষে মন্দ নয়, কি বলেন কাউন্ট?
হ্যাঁ ভালোই।
কালবিলম্ব না করে স্থানান্তরের কাজ আরম্ভ হয়ে গেল।
জায়গাটা আগেরটার মত আরামের না হলেও প্রাণটাকে টিকিয়ে রাখা যাবে।
নতুন ডেরাটি আপনার পছন্দ হয়েছে তো প্রফেসর?
আর তো মাত্র কয়েকটা মাস। তার পরেই শীত শেষ হয়ে গরম পড়তে শুরু করবে।

প্রফেসর রোসেট্টির অনুমান মিলে গেল। কিছুদিন পরেই আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন দেখা গেল।

বরফ গলতে শুরু করেছে। সমুদ্রের আসল চেহারা একটু একটু করে ফিরে আসছে।

সময় এগিয়ে আসছে - পৃথিবীতে ফিরে যাবার আর মাত্র মাসখানেক বাকী!
কিন্তু একটা কথা কী ভেবে দেখেছেন ?
কী কথা ?

ধূমকেতুটা যদি সরাসরি পৃথিবীর উপর আছড়ে পড়ে তাহলে তো আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব।
আমরা যে দিকটাতে রয়েছি সেই দিকটা পড়লে সমূহ বিপদ। কিন্তু উল্টোটাও তো হতে পারে...!

সংঘর্ষ যে দিকেই হোক ঝাঁকুনি হবেই। সেই ভয়ংকর কম্পন সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের হাতের আছে বলে তো মনে হয় না।

এ ছাড়া আরো একটা বিপদ আছে - তাপ! সেই ভয়ংকর মিলন লগ্নে তাপের প্রভাব কতদূর বাড়বে কে বলতে পারে।
বাঁচার কোন আশাই তাহলে দেখা যাচ্ছে না!
Goutam

হঠাৎ বেনজুফ অদ্ভুত একটি কথা বলে উঠল।

স্যার এই সময় আমরা যদি আকাশে উঠে পড়ি ?
40

ধূমকেতুর সওয়ার

● মূল কাহিনী – জুলেভার্ন (অফ অন এ কমেট)
চিত্রনাট্য — অনিল কর্মকার / চিত্রায়ন — গৌতম কর্মকার

বেনজুফের কথাটা মনে ধরল সারভাদাকের।
সুন্দর বলেছ বেনজুফ। আমরা যদি আকাশে উঠতে পারি তাহলে ভয়টা অনেক কম। বেলুন বানাতে পারলে ...

বেলুন বানাবেন কি দিয়ে?
ডোব্রিয়ানার পাল দিয়ে। পালের কাপড় মজবুত ও হাল্কা। কড়া করে বার্নিশ লাগিয়ে দিলে বাতাস চলাচলও বন্ধ হয়ে যাবে।

তারপর গরম বাতাস ভরে দিলেই বেলুন উড়তে শুরু করবে।
তা তো বুঝলাম, কিন্তু পৃথিবীর সাথে ধূমকেতুর সংঘর্ষের সঠিক মুহূর্তটি জানবেন কেমন করে?

এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন প্রফেসর রোসেট্টি।
ইদানিং উনি খিটখিটে হয়েছেন কথা বলে কার সাধ্যি!
দেখি চেষ্টা করে।

একদিন পাতাল গহ্বর ভীষন ভাবে কেঁপে উঠল।
ভূমিকম্প হচ্ছে!
সর্বনাশ, তাড়াতাড়ি বাইরে চলুন।

হুড়মুড় করে সকলেই বাইরে বেরিয়ে এল। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখা গেল এক আশ্চর্য দৃশ্য। ধূম্রপুচ্ছধারী টকটকে একটি অগ্নিগোলক হু হু করে মিলিয়ে যাচ্ছে মহাশূন্যে!

41

নতুন ধূমকেতু! নতুন ধূমকেতু!
মূর্খ, উজবুক কোথাকার। নতুন ধূমকেতু নয়– গ্যালিয়ারই একটি ছিন্ন অংশ। গ্যালিয়ার গা থেকে ছিটকে বেরিয়ে ঘুরতে শুরু করেছে নতুন কক্ষপথে।

সর্বনাশ! আয়তন কমে গেলে তো গ্যালিয়ার গতিবেগ পাল্টে যেতে পারে, তাই না প্রফেসর?
আহা মুখ্খু! তা হবে কেন? এতদিন তুমি কি শিখেছ শুনি?

যাই বলুন প্রফেসর, আমার তো মনে হচ্ছে কোনদিনই আমরা আর পৃথিবীর কাছাকাছি যেতে পারব না।
তাই নাকি?

মিলিয়ে নিও হে ছোকরা। পৃথিবীর সাথে আমরা আবার মিলিত হব আগামী পয়লা জানুয়ারী ভোর রাতে কাঁটায় কাঁটায় দুটো বিয়াল্লিশ মিনিট পঁয়ত্রিশ ছয় দশমাংশ সেকেন্ডে!
ধন্যবাদ প্রফেসর! শুধু এইটুকুই জানতে চাইছিলাম।

হাতে সময় বেশী নেই ক্যাপ্টেন, এবার তাহলে বেলুন তৈরির তোড়জোড় শুরু করতে হচ্ছে।
হ্যাঁ কাউন্ট, আজ থেকেই শুরু হোক।

শুরু হল নির্মাণ পর্ব।
বেলুন মোড়বার জন্যে প্রথমে জাহাজের দড়িদড়া দিয়ে বিশাল জাল বানাতে হবে, তারপর বেলুন।
42

সময় ঘনিয়ে এল। গরম বাতাস দিয়ে ভরাট করা হল বেলুনের গর্ভ। সকলেই একে একে এসে জড় হল বেলুনের দোলনায়, দেখা নেই কেবল প্রফেসরের।
প্রফেসর, প্রফেসর..
খোঁজাখুঁজির পর দেখা মিলল প্রফেসর রোসেট্টির।
তোমরা যাও সারভাদাক, আমি যাব না। প্রকৃতির ভয়ংকর অদ্ভুত রঙ্গ আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উপভোগ করব।
আপনার মত পণ্ডিতকে আমরা হারাতে রাজী নই।
চোখের ইঙ্গিতে কথা হয়ে গেল সাথের খালাসীটির সাথে। নিমেষে বৃদ্ধ প্রফেসরকে পাঁজাকোলা করে তুলে দোলনার দিকে ছুটে নিয়ে চলল খালাসীটি।
একি হচ্ছে! নামিয়ে দাও..
ঠিক সময়েই বেলুনের বাঁধন কেটে ফেলা হল। মুহূর্তের মধ্যেই হেলে দুলে একটু একটু করে উপরে উঠতে শুরু করল দৈত্যাকার বেলুনটি।
এই ভাবে বেশীক্ষণ ভেসে থাকা যাবে না।
ঘড়ির কাঁটা বিয়াল্লিশ মিনিট পার করে হেলতে শুরু করেছে। অসহায় মানুষগুলি রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে আছে ভয়ংকর মুহূর্তটির জন্যে।
আকাশের মাঝে ভেসে উঠল সুন্দর সবুজ পৃথিবীর বিশাল রূপ।
অদ্ভুত মহাজাগতিক শক্তির আকর্ষণে মানুষশুদ্ধ বেলুনটি যেন পালকের মত হাল্কা হয়ে গেল।
পৃথিবী, পৃথিবী কাছে আসছে!
43

সহসা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থর থর করে কেঁপে উঠল। আকাশ কাঁপছে, বাতাস কাঁপছে, কাঁপছে বিশ্বচরাচর। পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের দল পাকে পাকে ছেয়ে ফেলল আকাশ। অদ্ভুত রঙের বর্ণালীতে ভরে উঠল চারদিক। বহুবর্ণ রঞ্জিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটতে শুরু করল এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। ঘন ঘন বিদ্যুতের ঝলমলানি ছিঁড়ে ফেলতে লাগল আকাশ। সমস্ত দৃশ্যপট জুড়ে যেন অশরীরীদের বীভৎস তাণ্ডবলীলায় বিশ্বচরাচর লোপ পেতে শুরু করল। প্রলয় নাচনের অবর্ণনীয় দৃশ্য বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারল না নির্বাক মানুষগুলি। এক সময় জ্ঞান হারাল সকলেই।
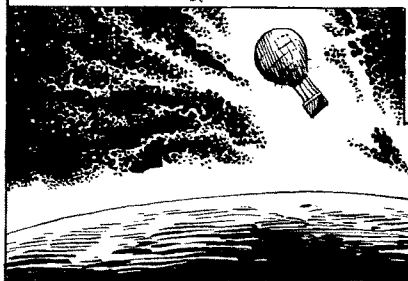
জ্ঞান ফিরল এক শান্ত শীতল পরিবেশে। মাথার উপর নির্মল আকাশ, নীচে গাঢ় সবুজ ঘাসের নরম গালিচা।

আচ্ছা প্রফেসর, গ্যালিয়া কি তাহলে পৃথিবীর উপর আছড়ে পড়ে নি?

হাঁটতে শুরু করলেন সকলেই।

শিবিরে ফিরে আসতেই সারভাদাককে নিয়ে হোরগোল পড়ে গেল।

কয়েকদিন পরে এক বন্ধুর সাথে দেখা।

কাউন্ট টিমাসেফ পাশেই ছিলেন, হো হো করে হেসে উঠলেন সারভাদাক।

শেষ